চিরায়ত বই

২৩

রক্তকরবী

রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KOBI PROKASHANI

রক্তকরবী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Raktakarabi by Rabindranath Tagore Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98111-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর করে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে—মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নামগ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অনুগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কিরকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

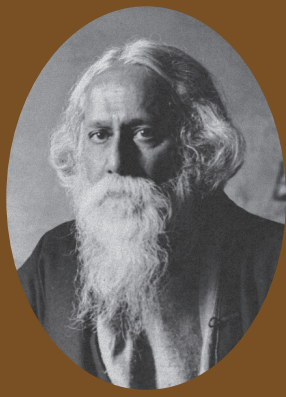

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ মে ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতার সঙ্গ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কৈশোরে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই মহিলার স্নেহস্মৃতি লালন করেছেন।

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *বনফুল* (১৮৭২) এবং *কবিকাহিনী* (১৮৭৮)। এগুলো তাঁর উন্মেষ পর্বের রচনা। *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১) নাটক, *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২), *প্রভাতসঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) প্রভৃতি রচনা থেকেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ। ১৮৯০ সালে *মানসী* কাব্যের প্রকাশ। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজনীশক্তি বিচিত্রপথে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কবিতার *Gitanjali* নামে ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। মূলত এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। ৭ আগস্ট ১৯৪১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

রক্তকরবী

এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে-যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

[প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে-যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে।

নন্দিনী। যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে, আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনায় গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ-যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয় লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মলিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

[অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।—তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ঐ কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি

করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী।

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।'

[প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী। পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত?

নন্দিনী। হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিন?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়ি-ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে—কোমল বলেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আর-এক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে। বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই?

নন্দিনী। ঘুরে ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বুঝিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া